M11/1/A1BEN/HP1/BEN/TZ0/XX

22110029

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A1 – HIGHER LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1

Wednesday 11 May 2011 (morning)
Mercredi 11 mai 2011 (matin)
Miércoles 11 de mayo de 2011 (mañana)

2 hours / 2 heures / 2 horas

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento.

2211-0029

© International Baccalaureate Organization 2011

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন ***একটিই*** *বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা কর :*

১।

ভীষণ মনোযোগে জমিদারির পুরোনো কাগজপত্র দেখছিলেন তিনি। এখন তিনি জমিদারির বিরাহিমপুর পরগণার সদর কাছারি শিলাইদহে। কুঠিবাড়ির তিনতলাতে তার ঘর–খুব প্রিয় জায়গা। এ ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে তার সামনে সেই পৃথিবীর ছবিটিই যেন ফুটে ওঠে, যেটি তিনি আর অন্য কোন দেশে পাননি। অনেক দেশের অনেক সুন্দর ছবি তিনি পেয়েছেন কিন্তু হৃদয়ের এত কাছের, এত ওমভরা, এত প্রাণমাতানো এবং এত আপন করা ছবি তার জীবনের সঞ্চয়ে একটিও নেই। এই ছবির সঙ্গে যুক্ত আছে একটি আশ্চর্য মায়াবী নদী। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি দিয়ে তিনি পড়ার ঘরটি ভরে ফেলেননি। এখন তিনি দোতলার বারান্দায়।

আষাঢ় মাসের বিকেল বেলা।

সারা দুপুর ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি হয়েছে। মাঠ–ঘাট–দিগন্ত ধোঁয়াশা করে রেখে এখন ছাড় দিয়েছে। চারদিক পরিষ্কার। বেশ লাগছে। মেঘের ফাঁকে সূর্যের আধো আধো ফুটে ওঠা ভাব। অপরূপ কমলা আলো চারদিকে যৌবনের সুষমা নিয়ে প্রবল তীব্রতায় ঠিকরে উঠেছে। অথচ স্নিগ্ধ মায়াময় স্পর্শে সেই তির্যকভাবকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রেখেছে। যেন কোন জাদুকরের অদৃশ্য মায়াবী খেলা। রবীন্দ্রের কাছেই যার আবেদন মূল্যবান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র বুঝতে পারে এমনই এক স্নিগ্ধ পরশ ওঁর চারপাশে সব ইন্দ্রিয় এক করে মালা গেঁথেছে।

আশ্চর্য। এখানকার পরিবেশটাই এমন–সবকিছু সুরের ভেতর সুরের মূর্ছনা, সৌন্দর্য, রঙ এবং ছবির বিন্যাস কিংবা নাটক বা নৃত্যের মতো সারিবদ্ধ পাখির উড়ে যাওয়া। এখানকার সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জীবন্ত মানুষ–কত তাদের কাজ, কত তাদের অভিব্যক্তি–মনে হয় হাঁ করে রাতদিন তাকিয়ে থাকি। কলকাতা থেকে এভাবে বেরিয়ে না পড়লে এসব মানুষের দেখা পাওয়া যেত না–আর এদের সঙ্গে দেখা না হলে জানার যে বিস্তৃত ভুবন পড়ে আছে তার দরজা কোনদিনই খোলা হতো না। বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখার সাধ বাড়িয়ে দেয়।

তখন গগনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কাছ থেকে। বোঝাই যায় যে ও বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকেছে। ও গলা ছেড়ে গান গাইছে না, গুন গুন করছে। রবীন্দ্র সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ পান. . . . . ও পোস্টঅফিসের ডাকহরকরা, সারা দিন ডাক নিয়ে এ–গ্রামে ও গ্রামে ঘোরে। ওর পায়ের শব্দ তো মৃদু হতে পারে না, শব্দে ঝঙ্কারও থাকবে না, সেটা তবলার বোলের মতোও হবে না। হবে অন্যরকম–কাঠ চেরাই করা, মাছ ধরা কিংবা ক্ষেত চষা মানুষের মতো। ওর পায়ের শব্দ শিলাইদহের নিজস্ব সংগীত। ভাবতেই রবীন্দ্রের বুক ভরা ওঠে। তখন শোনা যায় গগনের ডাক, বাবুমশায়।

আয় গগন, বোস। কেমন আছিস ?

আজ্ঞে, ভালো বাবুমশায়।

কার গান গাইছিলি ?

কাঙালের।

দুটো লাইন গেয়ে শোনাবি ?

কী যে বলেন বাবুমশায়, আপনি হুকুম করলেই হয়।

গগন হরকরা গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে গান ধরে।

গগনের উত্তাল কণ্ঠে কাঙাল হরিনাথের বাউলসংগীত কুঠীবাড়ির এলাকা ছেড়ে ছড়াতে থাকে শিলাইদহের মাঠে প্রান্তরে, মানুষের বসতির কুঁড়েঘরে।

রবীন্দ্র নিজের মধ্যে অস্থির তাড়না অনুভব করেন। শিলাইদহে না এলে এই বাউলদের গান বুঝি শোনা হতো না, এই বাউলদের সঙ্গে পরিচয় হতো না–কাঙাল হরিনাথ মজুমদার যে বাউল ফিকিরচাঁদ, এ তথ্যই বা কে তাকে দিতো ?

রবীন্দ্র আবার নিজেকেই বলেন, কী অপূর্ব কণ্ঠ। এখানকার বাউলেরা আমাকে পাগল করে দিল। ওদের গান শুনে আমার সামনে খুলে যায় এক–একটি দরজা। যে দরজা দিয়েই ঢুকি না কেন, দেখি নতুন গৃহস্থালি–কত তার রূপ, তার বৈচিত্র।

কুঠীবাড়ির থেকে রবীন্দ্র আবার খোরশেদপুর গ্রামের পুরোটা দেখতে চান–এককালে এটাই তো গ্রামটার নাম ছিল, শিলাইদহ এই গ্রামের অংশ। শিলাইদহ নামেরও কিংবদন্তী আছে। মানুষও কখনো কখনো কিংবদন্তী হয়। মানুষ বিশ্বাস করতে ভালবাসে, বিশ্বাসের মধ্যে নিজেকে খোঁজে। নিজের আনন্দ আবিষ্কার করে এবং তার একটা স্থায়ী রূপ দিয়ে সে বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এভাবেই কি তৈরি হয়েছে খোরশেদপুর গ্রাম ? সে মানুষটির একটি মাজার আছে এই গ্রামে। খোরশেদ ফকিরের দরগায় হিন্দু–মুসলমান ওরস পালন করে। মানত করে নিজের গাছের প্রথম ফলটি দিয়ে আসে কিংবা গাভির প্রথম দুধ। বিশ্বাস এই যে এটুকু করলে গাছ প্রচুর ফল দেবে, গাভি থাকবে দুগ্ধবতী। মানুষ এখনো বিশ্বাস করে, খোরশেদ ফকির একদিন খেয়া নৌকায় চড়ে নদী পাড়ি দিচ্ছিলেন। মাঝি তার কাছে পারাপারের জন্য কড়ি চাইল। ফকির বললেন, আমার কাছে তো কড়ি নেই। আমি আল্লার হুকুমে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। মাঝি রেগে বলল, আমি অতশত বুঝি না। পারানির কড়ি তোমাকে দিতেই হবে। কড়ি না থাকলে নৌকায় চড়লে কেন ? ফকির পদ্মার উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে বাবা, তা হলে আমি নেমে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার শুভ্র ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে ভেসে উঠল একটি চর। তিনি সেই চরেই নেমে পড়লেন।

ওই চরই হলো ফকিরের আস্তানা। গড়ে উঠল বসতি। ফকিরের অলৌকিকতায় মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। একদিন ফকিরের মৃত্যু হলে তার মাজার হলো দরগা। অসংখ্যবার শুনে ঘটনাটার এক ধরনের অভিঘাত তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রর মনে হয় মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানতে নেই, তাকে সহজ–সুন্দর পথে এগিয়ে দেওয়াই উচিত। তা যেন কলুষিত না হয়।

বাবার সঙ্গে কৈশোরে এসেছিলেন এই শিলাইদহে। বোটে ঘুরে বেরিয়েছিলেন পদ্মায়, দেখেছিলেন ঠাকুর এস্টেটের ঠিকানা, তার প্রকৃতি এবং মানুষ, যে মানুষদের এত কাছ থেকে কলকাতায় দেখা হয়নি। তখনই শুরু হয়েছিল নদীর সঙ্গে প্রেম। কেমন করে যেন নদী আর মানুষকে এক করে দেখতে শিখেছিলেন। এখনও সেই ঘোরে আছেন। বোটে উঠলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যৌবনে একবার নিজে ছিপনৌকো বেয়ে পারাপার করেছিলেন পদ্মানদী। এপার থেকে ওপার, ওপার থেকে এপার। কী অদ্ভুত রহস্যময়তায় নদীর স্রোত, আকাশ, গ্রাম এবং কুঠীবাড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যোতি দাদা এক হয়ে গিয়েছিলেন। শান্ত–স্নিগ্ধ কণ্ঠে জ্যোতি ডাকলেন, রবি এবার উঠে আয়। অনেক হয়েছে।
আসছি দাদা।

সেলিনা হোসেন, *পূর্ণ ছবির মগ্নতা* (অন্যপ্রকাশ, ২০০৮)

২।

হুলিয়া

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ,
শোঁ শোঁ করছে হাওয়া।
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে ।

কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল, একজন পেছন থেকে
কাঁধে হাত রেখে চিতকার করে উঠেছিল; –আমি সবাইকে
মানুষের সমিল চেহারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে, একজন রাজনৈতিক নেতা
তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন, মুখোমুখি বসে দূর থেকে
বারবার চেয়ে দেখলেন–, কিন্তু চিনতে পারলেন না।

বারহাট্টায়[১] নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,
অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
সেই একই ভাঙাপথ, একই কালোমাটির আল ধরে
গ্রামে ফেরা, আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।

আমি যখন গ্রামে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ,
শোঁ–শোঁ করছে হাওয়া।
অনেক বদলে গেছে বাড়িটা,
টিনের চাল থেকে শুরু করে পুকুরের জল,
ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল;
চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনখানে।

পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে–পড়া বেলিফুলের গাছ থেকে
একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে তার লক্লকে জিভ দেখালো।
স্বতঃ স্ফূর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে ঘাস, জঙ্গল,
গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে; যেন সবখানেই
সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে এখানে শাসন করছে গোঁয়ার প্রকৃতি।
একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়,
আমাকে দেখেই পালালো একজন, একজন গন্ধ শুঁকে নিয়ে
আমাকে চিনতে চেষ্টা করলো–যেমন পুলিশ–সমেত চেকার
তেজগাঁয়[২] আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।

পুকুরের জলে শব্দ উঠলো মাছের, আবার জিভ দেখালো সাপ,
শান্ত–স্থির–বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে
একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে – – ।
আমি বাড়ির পেছন থেকে দরোজায় টোকা দিয়ে
ডাকলুম, –“মা” ।
বহুদিন যে–দরোজা খোলেনি,
বহুদিন যে দরোজায় কোন কন্ঠস্বর ছিল না,
মরচে–পরা সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচ্‌ক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলো।
বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা–বিভাগ আমাকে ধরতে পারেনি,
চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে, অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি
কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দী হয়ে গেলুম;
সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে
একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম।

নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিত* (কাকলি প্রকাশনী, ২০০০)

১ বারহাট্টা: বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের অধীনে নেত্রকোনা জেলার একটি উপজেলা / থানা।

২ তেজগাঁ: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এলাকা। এখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অবস্থিত ।